প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

কল্যাণ দেশমুখ্য
বিষয় শিক্ষক, যুধিষ্ঠির সাহা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিহাড়া, কাছাড়, আসাম, ভারত।

কুমারেশ ঘোষ লিখেছেন---

'অম্লমধুর মস্করা আর
মুক্ত হাস্যরস
তাতেও আছে
বাঙালিদের বনেদী হাতযশ'।

হাসি মানুষের একটি সহজাত প্রবৃতি। হাসিতে মানসিক আনন্দময় অনুভূতি অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীব হল মানুষ। সেই মানুষ হাসতে পারে, হাসাতে পারে। সাধারণত আনন্দানুভূতি ব্যক্ত করবার জন্য মানুষ হেসে থাকে। তবে অন্যের ভ্রান্তি, অসঙ্গতি ও অক্ষমতা দর্শনেও হাসির উদ্রেক হয়। যে অনবরত হাসে সেই যে প্রকৃত হাস্যরসিক এমন নয়। প্রকৃত হাস্যরসিক নিজে খুব কম হাসে। কিন্তু অপরকে সে-ই বেশী হাসায়। তার আপাত গম্ভীর মুখের মধ্যে অফুরন্ত হাসির ফল্গুধারা লুকিয়ে থাকে। যারা হাসাতে পারে তারা ভাগ্যবান। সংসারের দুঃখ কষ্টের ভার তাদের কাছে লঘু হয়ে যায়। জীবনের সমস্যা তাদের কাছে সহজ হয়ে আসে। শরীর মন চাঙ্গা রাখার জন্য আজকাল অনেক যায়গায় 'লাফিং ক্লাব' খোলা হয়েছে। বহু মানুষ লাফিং ক্লাবের সদস্য হয়েছেন। সেখানে নিয়মিত প্রাণখোলা হাসির চর্চা হয়। ডাক্তার বাবুরা হাসিকে স্বাস্থের জন্য বিশেষ উপকারী বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিশুদ্ধ হাসি ফুসফুস ও দেহযন্ত্রকে সবল এবং সক্রিয় করে রাখে। হাস্যরসিক লোক চুম্বকের মত সকলকে আকর্ষন করে নিজের কাছে টেনে নিতে পারেন। হাস্যরসিক ব্যাক্তি তাই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকেন। এজন্যই প্রাণখোলা হাসি অব্যর্থ ঔষধ বলে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কাতুকুতু জনিত হসির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এই হাসি নিত্যান্তই স্থূল। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে কাতুকুতু দিলেই হাসি পায়। তবে সভ্য সমাজে এই সব হাসির কোন গুরুত্ব নেই। একাকী অবস্থায় থাকলেও হঠাৎ কোন আনন্দের কথা মনে পরলে লোকে হাসির মাধ্যমে আনন্দের কথা ব্যক্ত করে থাকে। একটা ঘঠনা অথবা চরিত্র দেখে একজনের হাসি পায়। অন্যজনের হাসি নাও পেতে পারে। এর কারণ হল, যখন যার মনে আনন্দ থাকে তখন সেই কেবল হাসতে পারে। হাসির জগতে উচচ-নীচ ভেদাভেদ নেই। ছোট-বড় পার্থক্য নেই। এই জগৎ পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক এক জগৎ। কেউ কেউ অন্যের হাসি দেখে কখন কখন হাসে। সেটা ভদ্রতা রক্ষার্থে হাসি। হাসির কারণ না বোঝেও কেবল অন্যের হাসি দেখে কেউ কেউ হাসে। পাছে লোকে বেরসিক ভাবে, সেজন্য হাসতে হয়। অনেক সময় ক্রুরতা ও নিষ্ঠুরতা ঢেকে রাখার জন্য অন্য আরেক রকম হাসি কেউ কেউ হেসে থাকে। উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের ভাষায় 'one may smile and smile a yet to be villain' এই ধরণের লোক হাসির ছদ্মবেশ ধারণ করে বাইরে অর্থাৎ জনসমক্ষে প্রমাণ করতে চায় সে কত কোমল প্রকৃতির ও সহানুভূতিশীল। শয়তান প্রকৃতির লোক নৃশংস কাজ করে পৈশাচিক অট্টহাসিতে সকলের মনে ত্রাস ও আতঙ্কের সঞ্চার করতে পারে। আরেক ধরণের হসি আছে যাকে বলে শ্লেষাত্বক হাসি। এই ধরণের হাসির মাধ্যমে তীব্র ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ বর্ষণ করা হয়ে থাকে।

অন্যের ত্রুটি, অসঙ্গতি ও দূর্বলতা লক্ষ্য করে আমরা হেসে থাকি। কৌতুক জনিত বাক্য এবং অভিনয়ও আমাদের হাস্য উৎপাদন করতে পারে। অন্যের বিকৃতি, ভূল,দোষ ও দুঃখ দেখে আমরা হাসি। যারা ওইসব কারণে হাস্যস্পদ, আমরা তাদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করি। তবে একথা ঠিক, মানুষের প্রতিমুহূর্তের ভূলের মধ্যে হাসির অসংখ্য উপকরণ নিহিত আছে। যে সব দৃষ্টি রেখে সর্বত্র খাপ খাইয়ে চলতে না পারে সে-ই এই সংসারে হাস্যস্পদ। মানুষ যখন যন্ত্রের মত সব সময় একই ধরণের আচরণ করে তখনই সে লোকের কাছে হাস্যস্পদ। কোনও বিশেষ প্রবৃত্তি, স্বভাব আচরণ যার মধ্যে বারবার দেখা যায় তার চরিত্র হস্যস্পদ। হাসি যখন এমন কারণ হতে উদ্ভুত যা সকলের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে তখনই তা সঙ্গত, শোভন ও স্বাবাভিক। সকলের মধ্যে একজন যদি না হাসে তবে সে বেরসিক বলে গণ্য হয়। তেমনি অন্য কেউ হাসছে না অথচ কেউ

একজন যদি হো হো করে হেসে উঠে তবে সে নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন হয়। হসির মধ্যে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন উপাদান ও রয়েছে। সে কারণেই হাসি বিশ্বমানবের সামগ্রী। হাসি চিরকালের উপভোগ্য অক্ষয় সম্পদ। চার্লি চ্যাপলিন অথবা লরেন হার্ডি বিশ্বের সকল দর্শকের মধ্যেই সমান হাস্য বিতরণ করেছেন। ডনকুইক্সোট ও পিকউইক চিরকাল বিশ্বের সকল পাঠককে পরিতুষ্ট করেছেন। বাংলা সিনেমাতে ভানু বন্দোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও আরও অনেকে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে দর্শকের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। লৌকিক হাস্য যখন সাহিত্যের হাস্যরসে পরিণত হয় তখন তা সর্বজন আস্বাদ্য হয়। এখন লোকে হাসে বটে। কিন্তু সেই হাসি ঠোটের সামান্য কম্পনের মধ্যেই সীমকাবদ্ধ থাকে। এখনকার হাসি এনামেল করা মুখের পালিশ করা হাসি। হাসি অনবরত চেপে রেখে মানুষ তার দেহ ও মনের অসুখ অনেক বেশী বাড়িয়ে তোলেছে। আধুনিক জগতের মানুষ নিজেকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত। ধন্ সম্পদ লাভের জন্য মানুষের প্রানান্তকর প্রচেষ্টা, চাওয়া এবং পাওয়ার দীর্ঘ গ্যাপের ফলে মানুষের হাসি কমে এসেছে। কিন্তু মানুষ যদি প্রাণখুলে হাসতে পারত তবে তার অনেক সমস্যা লঘু হয়ে যেত। তার অনেক দুখ কষ্ট কমে গিয়ে মনটা হাল্কা হয়ে যেত। ঘরোয়া ভাবে আমরা হাসিকে মুচকি হাসি, চাপা হসি, খিলখিল হাসি, অট্টহাসি ইত্যাদি কয়েকটি ভাগে করে থাকি।

হাস্যরসের যতরকম ভাগ আছে তার মধ্যে 'হিউমার' শ্রেষ্ঠ। হিউমারকে বলা হয় করুণ হাস্যরস। এই হাসি মৃদু এবং অনুচ্ছ। খাটি হাস্যরস স্রষ্টা জীবনকে দূর থেকে দেখেননা বা ভাবেননা। তিনি জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে এর রস মর্ম দিয়ে গ্রহণ করেন। জীবনের প্রতি সমবেদনশীল দৃষ্টি, সকলের প্রতি এক উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদ প্রিয়তার এক মিশ্রিত অনুভূতিই হল হিউমারের বৈশিষ্ট। আরেক রকম হাস্যরস আছে যার আবেদন বুদ্ধিশীল মস্তিষ্কে। ইংরেজিতে তাকেই বলে 'উইট' যার বাংলা হল বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরস। এই উইটের জগৎ সঞ্জান, সচেতন ও মননশীল। উইটের মধ্যে লেখক তার প্রাধান্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। তিনি হাসান কিন্তু নিজে হাসেননা। তিনি নাচান কিন্তু নিজে নাচেননা। হিউমার মৃদু ও গম্ভীর কিন্তু উইট তিব্র ক্ষনিক। হিউমার আমাদিগকে আবিষ্ট ও অবিভূত করে। কিন্তু উইট আমাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। হিউমারের অভিজ্ঞতার প্রকাশ, উইটে পাণ্ডিত্যের বিকাশ। হিউমার মানব জীবনের গভীর ও মৌলিক সমস্যা গুলো এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে উপভোগ করে, উইট আমাদের ভাসমান জীবণের বুদবুদ গুলো চকিত আলোকে উজ্জল করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্য হিউমার এবং শেষ জীবণের সাহিত্য উইটের নিদর্শন পাওয়া যায়। জগৎ বিখ্যাত নাট্যকার শেকসপীয়রের নাটকে উইট এবং হিউমারের চমৎকার সংমিশ্রন পরলক্ষিত হয়। বর্তমান জগতে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির কদর বেশী। সেজন্য বর্তমান সাহিত্যও হিউমার অপেক্ষা উইটের আধিপত্য অধিক। হিউমারের আবেদন সর্বদেশে এবং সর্বশ্রেণিতে। উইটের আবেদন বিশেষদেশে বিশেষশ্রেণিতে। হাস্যরসের অন্য আরেক বিভাগের নাম 'ব্যঙ্গরস'। ইংরেজীতে বলা হয় 'স্যাটায়ার'। যে হাসি আমাদের মুখকে প্রসন্ন না করে বিষন্ন করে তোলে যা আমাদের মনকে আমোদে উজ্জ্বল না করে আঘাতে দীর্ণ করে তোলে তা হল ব্যঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গকার বড় কঠোর, বড় নির্মম। তিনি মানুষের দোষ ও ব্যাধি নগ্ন করে পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হয়ে ওঠেন।। ব্যঙ্গের মধ্যে উপহাসের জ্বালা নিদারুণ রুপে বিদ্যমান। সেই জ্বালা আমাদের মনের মধ্যে তীব্র প্রদাহের সৃষ্টি করে। আমাদের দরদ, সহানুভূতি সব শুকিয়ে ফেলে। ব্যঙ্গের হাসিতে যোগ দিতে গিয়ে দেখি,সেই হাসি সপাং করে আমাদের বুকে চাবুক বসিয়ে দেয়। সেই চাবুকের আঘাতে মুখের হাসি বেদনায় বিকৃত হয়ে পড়ে। ব্যঙ্গকারের উদ্দেশ্য লেখনির মাধ্যমে শোধন করা, শিক্ষা দেওয়া। সমাজের যেখানে যত দোষ, যত অসঙ্গতি, যত রোগ সঞ্চিত হয়ে আছে তিনি তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সেসব অনাবৃত করে দেন। যা আমরা লুকিয়ে রাখতে চাই, ভূলে যেতে চাই, উপেক্ষা করতে চাই, ক্ষমা করে দিতে চাই, ব্যঙ্গকারের দৃষ্টি সে সকল বিষয়ের উপরই নিবদ্ধ থাকে। তার কাছে ক্ষমা নেই। তুচ্ছতম ত্রুটি এবং সামান্যতম দূর্বলতাও তার অনুকম্পা লাভ করতে পারে না। তার কাছে ঘেষতে ভয় হয়। কিজানি কখন তিনি কোন দূর্বলতা দেখে, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে আবার কশাঘাত করে বসেন। জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক ব্যাঙ্গাত্বক রচনা লিখে যশস্বী হয়েছেন। ব্যঙ্গের সর্বাপেক্ষা সক্ষম লেখক হছেন সুইফট। বাংলা সাহিত্য খাটি ব্যঙ্গ রচনার প্রবর্তক হিসাবে ভবানী চরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তার লেখা 'নববাবু বিলাস', 'নব বিবি বিলাস' ও 'নবদূতী বিলাস' বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ রচনার নিদর্শন। আরেক প্রকারের হাস্য রস আছে, যার নাম কৌতুক রস (ফান)। যেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তি প্রবণতা বা আমোদ প্রিয়তা, কোনও সূক্ষ্মতর কলা কৌশলের বা গভীর জীবনাভূতির নিয়ন্ত্রণাধীন না হয়ে উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্র কল্পনার সহায়তায় আমাদের হাসির উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে, সেখানে কৌতুক রসেরই প্রাধান্য। কৌতুকের জগৎ এক অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অরাজগতার জগৎ। সেখানে প্রবেশ করে আমরা সীমা সংযম ও শালীনতা ভূলে অনিয়ন্ত্রিত আমোদ-প্রমোদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়ি। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগল বুড়োতে' এবং অমৃতলাল বসুর 'চাটুয্যে ও বাড়ুয্যে' ও 'তাজ্জব ব্যাপার'- এ এবং পরশুরামের 'কজ্জলী' ও 'গড্ডলিকার' গল্পগুলোতে কৌতুকের হাসিই ফুটে উঠেছে। সর্বাপেক্ষা অধিক হাস্যরসের কবি হচ্ছেন ভারতচন্দ্র। তাঁর কবিতায় আদিরস ও হাস্যরসের গঙ্গা যমুনার সঙ্গম ঘঠেছে। দেবতা ও মানুষ সকলের প্রতি তাঁর রঙ্গ ব্যঙ্গ বাক্য নিক্ষেপ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে হাস্যরসের স্নিগ্ধধারা প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর রচনা রীতি সর্বত্র বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতায় উজ্জ্বল। তাঁর শ্রেষ্ঠ হাস্য রসের রচনা হল 'কমলাকান্তের দপ্তর'। হাসির গান লিখে যশস্বী হয়েছেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায়। তাঁর প্রহসনগুলোর মধ্যে যথেষ্ট হাস্য পরিহাস আছে। বাংলা সাহিত্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে হাস্যরসের মন্দাকিনি প্রবাহিত হয়েছে। হাস্যরসের সর্বক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করেছেন সাবলীল ভাবে। তাঁর হাস্যরস প্রসন্ন আকাশের নির্মল সূর্য কিরণের মত প্রদীপ্ত, শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক। শরৎচন্দ্রের হাস্যরস যথার্থ হিউমারের পর্যায়ে পড়ে। বেদনার সঙ্গে হাস্যের মণিকাঞ্চন যোগ দেখা যায় তাঁর সাহিত্যে। এছাড়া ও ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বসু, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, কেদার নাথ বন্দোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, রাজশেখর বসু,

প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি, দীনবন্ধু মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, শিব্রাম চক্রবর্তী, তারাপদ রায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

বাংলা সাহিত্য হাস্যরসের উল্লেখযোগ্য আরেক দিক হল 'প্যারডি'। পাশ্চাত্য সাহিত্য প্যারডি অতি প্রাচীন। কখন রঙ্গ কৌতুক কখন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। তবে মূল কবিতা জানা না থাকলে প্যারডির মজাই মাটি। প্যারডি সম্পর্কে প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখেছেন সতীশচন্দ্র ঘঠক,শিব্রাম চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, কবি শেখর কালিদাস রায়, পরিমল গোস্বামী, নলিনীকান্ত সরকার, চিত্তরঞ্জন লাহা এবং আরো অনেকে। সতীশচন্দ্র ঘঠক লিখেছেন, 'হাসির মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিলে এদেশের লোকে গাম্ভীর্য্যের সিলমোহর মারা মুখকে জ্ঞানের প্রতিমূর্তি মনে করিত না। ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রবীণতার পক্ককেশের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিত না এবং নিরপরাধী বালক-বালিকাদিগকে 'যত হাসি যত কান্না'র বিভিষীকা দেখাইতনা'। রবীন্দ্রনাথ ও স্বীকার করেছেন, 'কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে,উজ্জল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে'। জীবনে যেমন হাস্যরসের প্রয়োজন আছে, সাহিত্যে তেমনি প্যারডির প্রয়োজন আছে। কেননা, প্যারডি হলো সাহিত্যের রোমান্টিক অতিরেকের অব্যর্থ প্রতিষেধক। প্যারডি পরাশ্রয়ী রচনা। পরের রচনার রূপটিকে অক্ষুন্ন রেখে ভাবটিকে হাসির স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে প্যারডি। কাজেই প্যারডি রচনার মূল শর্ত হল, মূলের ছাদটিকে অবিকল রক্ষা করা। আদলে অনুরুপ না হলে আদৌ সেটা প্যারডি হবে না। কাজেই প্যারডিকারকে অতি অবশ্যই একজন প্রথম শ্রেণীর ছন্দশিল্পী হতে হবে। ছন্দের নিঁখুত জ্ঞান প্যারডি রচনার অপরিহার্য শর্ত। অপরের মাঠে গোল দিতে হলে সে মাঠের ভূ-গোলটির নির্ভূল পাঠ আয়ত্ত করা প্রয়োজন। শিব্রাম চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে গেলে, 'সব খেলাই যে জানে, সব খেলাই সে পারে, কিন্তু খেলতে গিয়ে কি যে হয়ে যায়, খেলাটা হাসিল হয় না, হাসির হয়ে ওঠে। আর বলাই বাহুল্য যে, হাসির হলেই তাঁর খেলা হাসিল হয়'। উদাহরণ স্বরুপ কিছু কবিতা ও গদ্যের আংশিক প্যারডিরূপ এখানে উপস্থাপন করছি। রবি ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার অনুকরণে প্রবুদ্ধ লিখেছেন ' নাগরিকের আশাভঙ্গ'।

'প্রভাতে দেখিনু কে তস্কর
খোলা রেখে গেছে ভাঁড়ার ঘর
কেমনে পশিল রাতের আঁধারে ভেঙে তালা, ভেঙে খিল্।
ভাবিতেই ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়, ধড়ফড় করে দিল্।
গায়েতে দিতেছে ঘাম
ওরে মাথাটা উঠিছে ঘুরি
এ যে নিশ্চয় দাগী রহমন, যে ব্যাটা করেছে চুরি।
থর থর করি ক্রোধে কাঁপি আমি
খক্ খক্ করি উঠিনু কেশে
ক্রোধে হাত হতে হুঁকো পড়ে খসি
কাপির গমকে যাব কি টেঁসে?
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ছোটাছোটি করি মালের আশায়
ডায়েরি করেছি থানায়, তবুও স্টেপ নাহি নেয়, মানিনু হার।
কেনরে দারোগা চুপচাপ হেন
বদনাম দেয় সবাই কেন?
ছাড়রে কুড়েমি, ছাড়্ 'ওয়ারেন্ট'
তুই যে রে জনগণ 'সারভেন্ট'
দাগী চুরটারে হাজতে পুরিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'- গানটির অনুকরণে যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'আমার চশমা'।

'সোনা রূপায় কেমন গড়া, আমাদের এই চশমা জোড়া,
তাহার মাঝে আছে পেবল্ সকল চোখের সেরা;
ও সে পাথর দিয়ে তৈরী সেটা, ধাতু দিয়ে ঘেরা।
এমন চশমা কোথাও খুঁজে পাবে নাকো জানি,
সকল দেশের পুজ্য সে যে আমার চশাম খানি।।
ভালো খাঁটি চশমা ছাড়া, কোথায় আঁখি এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে আলো এমন নকল চোখে।
ও তার ঝিক্ মিকিতে আমোদ বাড়ে, মাথায় খেয়াল ঢোকে
এমন চশমা কোথায় খোজে পাবে নাক জানি,

সকল দেশের পুজ্য সে যে আমার চশমাখানি'।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' কবিতার অনুকরণে সতীশচন্দ্র ঘঠক লিখেছেন 'বাংলার ঢেঁকি'।

'বাংলার ঢেঁকি বাংলার কুলো
বাংলার হাঁড়ি বাংলার চুলো
পূজ্য হউক পূজ্য হউক
পূজ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার টিকি বাংলার কোঁচা
বাংলার কচু বাংলার মোচা
দীর্ঘ হউক দীর্ঘ হউক
দীর্ঘ হউক, হে ভগবান'।

অতুল প্রসাদ সেনের 'মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা' গানটির অনুকরণে সুদর্শন চক্রবর্তী লিখেছেন-

'মোদের গরব হায় বাংলা, ভাগ করে দেশ দুটি ফালা।
তোমার ছেলে তোমায় ভোলে, হয়েছে সব বম্বেওলা।
কি যাদু হিন্দি গানে, নেই কোন তার মুন্ডু মানে,
গেয়ে গান ডিস্কো নাচে, গান শুনে কান কালাপালা'।

রবি ঠাকুরের কণিকা অবলম্বনে শান্তশীল দাস লিখেছেন-

'চক্রবর্তী গিন্নি বলে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
বোস গিন্নি বেশী সুখী আমার বিশ্বাস।
বোস গিন্নি দুঃখ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
চক্রবর্তী গিন্নির সুঃখ হারিয়েছে আমারে'।

মেঘনাদ বধ কাব্যে 'সীতা ও সরমার কথোপকথনে'র অনুকরণে কুমারেশ ঘোষ উপস্থাপন করেছেন 'নন্দিনী রমাও গীতা বৌদির কথোপকথন'।

'ছিনু মোরা, নন্দিনী, বালিগঞ্জ প্লেসে
কপোত-কপোতী যথা উচ্ছ বৃক্ষ- চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে, ছিনু আধুনিক
এক ফ্লেটে, মর্তে দূর-বন সম।
চাকর থাকিত হাজির। ভাবি দেখ মনে
কিসের অভাব আর। আনিত কিনিয়া
নিত্য চপ্ কাটলেট সে ছোকরা। অফিস
করিত মনু-দা। ফিরিবার পথে প্রায়
আনিত কিনিয়া, সখি, এটা ওটা সেটা-
দয়ার সাগর ভাই, বিদিত জগতে।
ভুলিনু পূর্বের দুঃখ। রাজার নন্দিনি
নহি, কুল-বধু আমি; কিন্তু অবহেলা?
তুমি তো গো রমা দেবী, সাক্ষী আছো তার।
বাড়িটার চারিদিগে কত যে জঞ্জাল
নিজ হাতে নিত্য কত ঝিয়ের মতন
করিয়াছো পরিস্কার, তবু গালাগালি'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হেঁই মারো মারোটান হেঁইয়' এর ব্যঙ্গরূপ দিয়েছেন সুকবি ও সাহিত্যিক সরিৎশেখর মজুমদার। তিনি লিখেছেন-

'পরমায়ু ধায় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো মেয়ে! নাওখানি বাইয়ো।
সংসারে ধরো হাল, বসে খাবে পিন্টু পাল,
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।।
পায়ে মল পরিবার, ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার;
ওটা বুঝি ঘরনীর ক্রন্দন শঙ্কার;
রন্ধন দু'বেলার সহ্য হবে না যার
টলটল করে বুঝি তাইও।

হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো'।।

বঙ্কিম চন্দ্রের 'বাবু' রচনার অনুকরণে কুমারেশ ঘোষ লিখেছেন 'মস্তান'।

'হে রাজন যাঁহার চিত্রবিচিত্র পোষাকাবৃত, বোমহস্ত, উগ্রকুন্তল, দাড়ি-গোঁফ শোভিত, স্যাণ্ডেল পরিহিত, তাঁহারাই মস্তান।

যাঁহার বাক্য অজেয়, পরভাষা পারদর্শী, বঙ্গভাষা বিরোধী তাঁহারাই মস্তান তাঁহারাই মস্তান।

মহারাজ, এমন অনেক মহাবুদ্ধি সম্পন্ন মস্তান জন্মাইয়াছেন এবং জন্মিবেন যে, তাঁহারা বঙ্গভাষা বা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন।

যাহারা চাঁদা আদায়ে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয় করিতে পরকে বঞ্চনা করিবেন, নিজেকে বঞ্চনা করিয়া বিদ্যার্জন করিবেন এবং সেজন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন বা পরীক্ষায় টুকিবেন, তাহারাই মস্তান।

যিনি অন্যের কঠোর সমালোচনা করেন, অথচ নিজের সমালোচনায় রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন, তিনিই মস্তান।

যিনি পুস্তকের মলাটে লেখা পরিচয়পত্র পড়িয়া পণ্ডিত হন, বিশেষ কারনে উত্তম পুস্তককে গালি দেন, পত্রিকার সম্পাদনায় নামী লেখকের পদলেহী অথচ নতুন ভাল লেখকের উপর খড়্গধারী, তিনিই মস্তান।

যিনি ভোটের সময় ভিক্ষাপ্রার্থী, গদি পাইলে নবাব রূপী, এবং তখন বহুরূপী, তিনিই মস্তান।

যিনি চাঁদা তুলিয়া দুর্গাপূজা, বোম ফাটাইয়া কালিপুজা করেন, মাইকে হিন্দি গান বাজাইয়া অন্যান্য পুজা করেন সময়মত বিসর্জন দেননা। বলেন, তোমায় ভালবাসি মা, তাইতো করি বাসি মা, তিনিই আসল মস্তান।

যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, নৃত্যে শতগুণ, এবং মুখে আগুণ, তিনিই মস্তান।

যাঁহার ইষ্টদেবতা সিনেমা, গুরু সিনেমা স্টার, প্রধান পাঠ্য অশ্লিল পুস্তক এবং তীর্থক্ষেত্রে জুয়ার আড্ডা, তিনিই মস্তান।

যিনি নিজগৃহে জলখান, বন্ধু গৃহে মদ গাজা খান, প্রেমিকার কাছে গালি খান, মনিবের গলা ধাক্কা খান, অথচ সাধারণের কাছে ড্রাগস খাইয়া ড্রাগন হন, তিনিই মস্তান।

যাঁহার স্নানে তৈলে ঘৃণা, চুলের জন্য চিরুণিতে ঘৃণা, ক্ষৌরকার্যে ক্ষুরে ঘৃণা, আহারে আঙুলে ঘৃণা, কথাবার্তায় বাংলা ভাষায় ঘৃণা এবং সৎসঙ্গে অতি ঘৃণা, তিনিই মস্তান'।

বিবেকানন্দের 'হে ভারত ভুলিও না' অনুকরণে কুমারেশ ঘোষ লিখেছেন-

'ভুলিওনা তোমার নারী জাতির আদর্শ ফিল্মস্টার, পপনতর্কী। ভুলিওনা তোমার আদর্শ সুখ্যাত কুখ্যাত নর্তক মার্কিন মাইকেল জনসন। ভুলিওনা তোমার জীবন যৌবন ধনমান স্রেফ ব্যাক্তিগত সুখের জন্য, অন্যের সুখের জন্য নহে। একদম ভুলিওনা, একমাত্রই ছাগই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। তুমি মায়ের নামে সেই ছাগ মাংসের অধিকারী (অবশ্য পয়সা দিয়া)। ভুলিওনা তোমার সমাজ পার্কে, ক্লাবে বা প্রিয়ার সহিত নিভৃতে কোনও বনে-বাদারে।

ভুলিওনা নীচ জাতি, মূর্খ, অজ্ঞ, দরিদ্র, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত খাদক, তোমার শত্রু।

হে বাক্যবীর মুখে শ্লোগান ছাড়ো, সদর্পে বলো- মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার ভাই না ছাই'।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগরের রচিত 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' নামক রচনাটির প্যারডি করেছেন শ্রদ্ধেয় কুমারেশ ঘোষ।

'প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল। মিসেস গৌতমী এবং মাস্টার শাঙ্গরব ও শারদ্বত (দুই দাঁত ভাঙ্গা নামকে সরল করিয়া সরোজ এবং শরৎ করা গেল) নামে পাড়াতুতো দ্যি দাদা শকুন্তলার সমভি ব্যাবহারে গমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অস্পূয়া এবং প্রিয়ংবদা যথা সম্ভব স্নো- পাউডার, লিপস্টিক মাখাইয়া বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। কর্তা (মহর্ষি এ যুগে কই?) শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন ধড়াস ধড়াস করিতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইয়া চশমা যুগল ঝাপসা হইয়া যাইতেছে। গৃহিণী রোষ ভীত প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া বাকশক্তি রহিত হইতেছে, বাতব্যাধির মতই জড়তায় নিতান্ত অতিভূত হইতেছি। কী আশ্চর্য্য! আমি ক্লাব আড্ডাধারী, অথচ সংসারে টান বশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে।না জানি সংসার কীটেরা এমন অবস্থায় কী দুসঃহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম সংসার আতি বিষময় বস্তু। অনন্তর তিনি কোঁচার খুঁট দিয়া চশমার কাঁচ পরিষ্কার করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন শুকু বেলা হইতেছে। ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, আর অনর্থক কাল হরণ করিয়া লাভটা কি? এই বলিয়া উপস্থিত পাড়া পড়শীদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শুকু কাহারও অন্যায় দেখিলে তাহার মুণ্ডপাত না করিয়া কদাচ জলপান করিত না, কাহারও নতুন ডিজাইনের গহনা বা শাড়ী দেখিলে প্রসংসায় পঞ্চমুখ হইয়া আমাকে এইরূপ কিনিয়া দিবার দাবি জানাইতে ভুলিতনা, আপনাদের কাহারাও প্রসবের সময় উপস্থিত হলে নার্সিং হোমে ছুটিতে আনন্দের সীমা থাকিত না। অদ্য সেই শুকু পতিগৃহে যাইতেছে, আপনারা সকলে কংগ্রেচুলেশন জানান'।

একজন লোক দিনের বেলা বাড়ী থেকে বেরোতেননা। সন্ধ্যের পর ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন। লোকে উনাকে 'নিশাচর' নামে সম্বোধন করত। তিনি নাকি প্রেমের প্রবল টানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একদিন পথে দেখা হতেই প্রশ্ন করলাম, 'প্রেম সম্পর্কে আপনার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা কি রকম'? তিনি বললেন, ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত একটি গানের সুরেই আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। এই বলে তিনি গাইতে শুরু করলেন-

'আমি এক নিশাচর।
প্রণয়িনী আমারে আদর করেছে
ভুলেও হয়নি বর।

তাই আমি নিশাচর।
আমি ভাঙ্গার থেকে মামির বাড়ী হয়ে
সুরমার মুখ দেখেছি।
আমি আনিপুর থেকে অস্ট্রেলিয়া হয়ে
মরিশাসের মুলো খেয়েছি।
আমি ইলোরা হোটেল থেকে খেয়ে দেয়ে
স্ট্রং হয়ে সিঙ্গাপুর শহরে গিয়েছি।
কপালের ফের, কুমিল্লায় গিয়ে
পুলিশের গল্লা খেয়েছি।
মাইকেলের সমাধিতে বসে
নজরুলের কথা ভেবেছি।
বারে বারে প্রেমের টানেই
পথকেই করেছি ঘ-অ-অ-র
তাই আমি নিশাচর'।

তথ্যসূত্রঃ

১। বঙ্গসাহিত্যে হাস্য রসের ধারা- ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।
২। যষ্টিমধু (প্যারিড সংখ্যা ১৪০১) কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত।
৩। ভূপেন হাজারিকার গানের প্যারিডটি এই প্রবন্ধকারের রচিত।

*****